

সূচিপত্র

১ সাধ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
২ টুনটুনি আর বিড়ালের কথা	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৯
৩ আমাদের গ্রাম	বন্দ্যে আলি মিঞা	১১
৪ দ্বিপকুর বৃদ্ধি	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	১২
৫ ভানপিটে	সুকুমার রায়	১৪
৬ কুমিরের গিলে	ছিত্তিশ্রনাথ রায় ভট্টাচার্য	১৫
৭ ফুটিমুঠে জোছনা	মোহিতলাল মজুমদার	১৭
৮ ঢাকার কথা	কৃত্তবিহারী গাল	১৮
৯ ওই এল অতু	সুনির্মল বসু	২০
১০ এজারেস্ট জয়	—	২১
১১ গিরু চোর	নজরুল ইসলাম	২৩
১২ মহিমে মানুষে	ঘোষীন্দ্রনাথ সরকার	২৫
১৩ মিন্যাসাপর	—	২৭
১৪ নয়মাসের শেঠ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
১৫ সেশরজ্ঞা	—	৩১
১৬ পাণ্ডিত্য গান	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৪
১৭ পাণ্ডালা জার নদীর জল	মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬
১৮ রত্নপের বসুন্ধা	—	৩৯
১৯ সমস্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২
২০ সকলের ভরে সকলে আমরা	—	৪৪
২১ চকু ইটি	প্রমোদ মিত্র	৪৭
২২ আশ্রয় মাঝির দল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৯
২৩ শরীরের মাজমশরা	সুকুমার রায়	৫১
২৪ মাঝিধান	—	৫৩

সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কত দিন ভাবে ফুল,
উড়ে যাব কবে,
যেথা খুঁশি সেথা যাব,
ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন
ঝোলি দিল ডানা।
প্রজাপতি হল, তারে
কে করিবে মানা?

রোজ রোজ ভাবে বসে
প্রদীপের আলো,
উড়িতে পেতাম যদি
হত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে
কবে পেল পাখা
জোনাকি হল সে, ঘরে
যায় না তো রাখা।



পুকুরের জল ভাবে,
চুপ করে থাকি—
হায়, হায়, কী মজায়
উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি
ঘোঁরা ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে
গেল অবহেলে।



আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে
গাঠ হব পারি,
কভু ভাবি মাছ হয়ে
কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি, পাখি হয়ে
উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি
ভাবি যীহা মনে?



অনুশীলনী

- কে কী ভাবছে? (বা শিকের অংশের সঙ্গে ডানদিকের ঠিক অংশটি মিলিয়ে উত্তর করো।)
 ফুল ভাবছে
 প্রতীপের আলো ভাবছে
 পুকুরের জল ভাবছে
 পাখিরা মজা করে উড়ে যায়।
 আমিও উড়তে পারলে ভালো হত।
 আমি যেখানে খুলি সেখানে উড়ে যাব।
- কার সাথ কীভাবে মিটল? (একইভাবে উত্তর করো।)
 ফুল
 পুকুরের জল
 প্রতীপের আলো
 একদিন মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে গেল।
 একদিন প্রজাপতির মতো ডানা মেলে দিল।
 জোনাকিও পাখা পেয়ে গেল।
- মিল দাও



(১)
 থাকত ঘিঁষি তানা
 দুই পাশে দুই.....
 আকাশ ছঁতাম পাখির মতো
 করত না কেউ.....

(২)
 উঠল ডাকি
 একটি.....।
 একটু স্তোরেব আলো
 নামছে বড়োই.....।

মৌখিক

প্রতিটি আকৃতি করো।

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে।
সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে
টুনটুনি পার্খিটি তার বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে তিনটি ছোট ছোট ছানা
হয়েছে। খুব ছোট ছানা, তারা উড়তে পারে
না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে, আর চি-চি করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব'।
একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, 'কী করছিলা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম
হই, মহারানী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল। এমনি সে রোজ আসে, রোজ
টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড়ো হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা
আর চোখ বুলে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে
পারাবি?'

ছানারা বললে, 'হাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ
তো দেখি, ঐ তালগাছটার ডালে
গিয়ে বসতে পারিস কি না!'

ছানারা তখনি উড়ে গিয়ে
তালগাছের ডালে বসল। তা দেখে
টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন
দুষ্টু বিড়াল আসুক দেখি!'





খানিক বাদেই বিড়াল এসে বলল, কী করছিছ' লা টুনটুনি'? তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দে'খিয়ে বললে, 'দূর, হ' লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী।' বলেই সে ফড়ুক করে

উড়ে পালাল।

দু'স্ট বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনি'কেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হ'য়ে ঘরে ফিরল।

অনুশীলনী

১. দুধ থেকে ছানা হয়। 'ছানা' শব্দটি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে আরো দুটি বাক্য তৈরি করো।
২. বন্ধনীর শব্দগুলোর জায়গায় গল্পটি থেকে একই অর্থের শব্দ খুঁজে নিয়ে বসো।
টুনটুনি মাথা (নীচু) করল। ছোট ছানা (গুধু) হা করে। বিড়ালনী (প্রতিদিন) আসে। তারা চোখ (বন্ধ করে) থাকে না। বিড়ালনী খুব (জঙ্গ) হয়ে ফিরে যায়।
৩. বিড়ালটা কী ছষ্টু'মি করেছিল? [শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে লেখো]
বিড়ালটা ——— খেতে চেয়েছিল।
৪. টুনটুনি কীভাবে তার ছানা'দের ঝাটিয়েছিল? [শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে উত্তর করো]



- বেড়াল এলেই টুনটুনি তাকে ———।
তাতে বেড়াল ———।
এমনি করে টুনটুনির ছানা'গুলো ———।
তারা উড়ে গিয়ে ———।
বেড়াল আর তাদের খেতে পারল না।
৫. ছানারা উড়ে গেল। বেড়াল এল। এবার টুনটুনি কী করল?
 ৬. ছষ্টু বেড়াল কীভাবে জঙ্গ হল লেখো।

মৌখিক

১. বিড়ালটা কীভাবে জঙ্গ হয়েছিল বলো।
২. শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে একটি বেড়ালের গল্প অথবা একটি পাখির গল্প শুনে নাও। তারপর সেই গল্পটি নিজে বলো।

আমাদের গ্রাম

রবীন্দ্র আলি মিশ্র

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ভরি।

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচিয়েছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দীঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিঝিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন,
সকালে সোনার রবি পূর্ব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতায় একটি গ্রামের বর্ণনা আছে। গ্রামটিতে কী কী আছে? কবিতাটি ভালো করে পড়ে নিয়ে শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসিয়ে লেখো।
ছোটো ছোটো — , মাঠ ভরা — , জলভরা — , চাঁদের — আমগাছ —
পাখি — , — ফুল।

২.



ছবিটি খাতায় আঁকো।

নীচে লেখো আমাদের গ্রাম।

এই গ্রাম সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. কবিতাটি সমবেত করে আবৃত্তি করো।
২. নিজেদের গ্রাম অথবা শহর সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য বলো।

পিঁপড়ের বুদ্ধি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

একবার আমার আঠার শিশির মধ্যে একটা আরশোলা পড়ে মরেছিল। আরশোলা-সমেত আঠা এক স্থানে ঢেলে ফেলে দিলাম। কিছু পরে আরশোলার দেহটা খাবার জন্য লাল রঙের এক প্রকার খুঁদে বিষ-পিঁপড়ে আঠার চারদিক ঘেরাও করল। 'কলকাতার চারদিকে এই বিষ-পিঁপড়ে সব সময় দেখা যায়। দু-চারটে পিঁপড়ে আরশোলার কাছে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তরল আঠার মধ্যে বন্দী হয়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম,—বেশ হয়েছে—এবার আর আরশোলার দেহ উদরসাৎ করতে হবে না। আমি পাশ কাটিয়ে কাজে চলে গেলাম।



প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলাম। তখনও তারা মৃত আরশোলার দেহটার আশা ছাড়ে নি। বরং সেখানে পিঁপড়ের সংখ্যা আরও বেশি হয়েছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পিঁপড়গুলির মুখে কণা-কণা কাঁকর। কাঁকর মুখে করে আঠার ওপর তারা জড়ো করছে। সময়ের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে তারা কাঁকর বয়ে নিয়ে গেল। আঠার ওপর তারা একটা কাঁকরের পথ তৈরি করে ফেলল। এখন দলে দলে পিঁপড়ে সেই পথের উপর দিয়ে এগুতে লাগল। এভাবে আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর দেখি,—আরশোলাটার ছোটো ছোটো দেহখণ্ড মুখে করে কাঁকর-পথ ধরে সার বেঁধে মহোলাসে তারা বাসার দিকে এগুচ্ছে।



অনুশীলনী

১. আরেকটি অর্থ দেখিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে আরেকটি করে বাক্য গঠন করো—
 পাশ : আমি এবার পাশ করেছি। ধরে : আমগাছে আমি ধরে।
 পাশ : ধরে :
 কেটে : ছুরিতে হাত কেটে যেতে পারে। তারা : রাজে আকাশে তারা দেখা যায়।
 কেটে : তারা :

২. বন্ধনীর শব্দগুলোর জায়গায় একই অর্থের নতুন শব্দ বসান। বইয়ের শেষে অভিধান দেখো—



মাঠে অনেক (খুঁদে খুঁদে) ছেলে জড়ো হয়েছে।
 কোনো দিকে তাদের (ভ্রূক্ষেপ) নেই।
 (মহোলাসে) সবাই খেলা করছে।
 দেখে তারি (অদ্ভুত) লাগল আমার।

৩. পূর্ণ-বাক্যে উত্তর লেখো :

(ক) আরশোলাটা কীভাবে মারা যায়? (খ) তবল আঠার মধ্যে পড়ে পিঁপড়ের কী দশা হল? (গ) পিঁপড়েরা কীভাবে পথ তৈরি করল? (ঘ) একঘণ্টা পর তারা কী করল?

মৌখিক

১. জীবজন্তু-পশুপাখির বুদ্ধির কোনো গল্প শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে শুনে নাও। তারপর সেই গল্পটি নিজের বন্ধুকে বলো।

চাকার কথা

কুজবিহারী পাল

ছোট্ট খোকা হাটিতে পারে না। তাহলে
এ ঘর থেকে ও ঘরে সে যার কী করে? কেন,
কোলে চড়ে।

পাহাড়ের ওপর রয়েছে মন্দির। সেখানে
গিয়ে পূজা করতে চায় বয়স্ক লোক। কিন্তু
পাহাড়ে ওঠবার শক্তি নেই। তখন? লোকের
ঘাড়ে বসে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? আর পয়সা
দিলে ওরকম বাহন পাওয়াও কিছু কঠিন নয়।

চলাফেরার ব্যাপারে পায়ে হেঁটে, কোলে,
পিঠে বা কাঁধে চড়ে যাওয়া আদিম উপায়।

মানুষ বৃদ্ধিতে হল সব প্রাণীর সেরা।
কাজেই চলাফেরার ব্যাপারটার উন্নতি তানা
করল। বনের পশুকে বশ মানিয়ে তাদের বাহন
করল। তাদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে আনা-
নেওয়া চলল। তাদের পিঠে চড়ে খাতায়াত
চলল। জন্তুর পিঠে চেপে বেড়ানোও কিন্তু
চলাফেরার একমাত্র উপায় বলে মানুষ মনে করে
নি। একাজে ডুলি, পালকিও তারা ব্যবহার
করেছে। এও একরকম মানুষের কাঁধে চড়েই
বেড়ানো। রাজা-মহারাজা বা সমাজের ধনী
লোকেরাই এগুলো ব্যবহার করতেন।

বৃদ্ধিমান মানুষ আরও উন্নতির কথা ভাবতে
লাগল। কম সময়ে কী করে যাতায়াত করা যায়?
কম শ্রমে কী করে ভারী মালপত্র বয়ে নেওয়া
যায়? ভাবতে ভাবতে চাকার আবিষ্কার করল
মানুষ। কে প্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিল?
কবে করেছিল? সে কথা আজ আর বলা সম্ভব
নয়। তবে একটু কল্পনা করো। গাছের গুঁড়ি
গাড়িয়ে চলেছে। বৃদ্ধিমান মানুষ দেখে দেখে
ভাবল-বড়ো মজার, বড়ো মজার। হয়তো এই থেকে
চাকার আবিষ্কার হল।

চাকার ধারণা কিন্তু ভারতে অনেক আগে
এসেছিল। তবে আজকের চেহারা চাকা ছিল
না। বহুদিন ধরে একটু একটু করে উন্নতি হয়ে
তবেই চাকা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। প্রাচীন



কালের সভা জাতিরা সকলেই চাকার ব্যবহার জানত। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের একটা খেলনা-গাড়ি পাওয়া গেছে। সে গাড়িতে চাকা লাগানো আছে। চাকার প্রথম ধারণার সময়টা নিশ্চয়ই তারও বহু দিন আগেকার ব্যাপার।



সে বা হোক। চাকার আবিষ্কার তো হয়ে গেল। আর ভাবনা কী? মানুষ বসবার বা দাঁড়বার মতো, মালপত্র রাখবার মতো একটা জায়গা বানিয়ে নিল। তার সঙ্গে জুড়ে দিল দুটো চাকা। এবার গোরু, মোষ বা ঘোড়া দিয়ে টেনে নিলেই হল। ফলে পাওয়া গেল গাড়ি। ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। সে সময় একে বলা হত রথ। কলকাতায় তোমরা ট্রাম দেখেছ। এক সময় এই ট্রাম — গাড়িও ঘোড়ায় টানত।

আজকের দিনে প্রায় সব যন্ত্রই, প্রায় সব যানবাহনই চাকার সাহায্য নেয়। বলতে গেলে চাকাই গতির পথ খুলে দিয়েছে। মানব-সমাজের অগ্রগতি ওই চাকার চেপেই এসেছে।

অনুশীলনী

১. 'জুড়ে', 'চেপে', 'পিটে', 'সভা'—শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসায়।
সে হঠাৎ কান্না... দিল। আমাদের বাড়িতে আজ তালের...। তিনি আমাদের কবের...।
আদম মাহুম ... ছিল না। এখানটার হাত দিয়ে... রাখো। কাগজগুলো আঠা দিয়ে...
দাও। আসল কথাটা সে ... রেখেছে। সে ঘোড়ার ... চেপে বসল।
২. আগেকার দিনে চলা-ফেরার জন্য মাহুম কী কী যানবাহন ব্যবহার করত?
৩. তুমি যে সব যানে চড়েছ সেগুলো সখ্বে চুটি করে বাক্য লেখো।

মৌখিক

শিক্ষক মহাশয় চাকার সংখ্যা উল্লেখ করবেন। শিক্ষার্থীরা সেই সংখ্যক চাকার যানের নাম বলবে—ভূঁই চাকা, তিন চাকা, চার চাকা, অনেক চাকা।

ওই এল ঝড়

সুনির্মল বসু

শালবনে হুল্লোড়—

ওই এল ঝড়,
মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি,
চল্ ভাই ঘর।

দোলা লাগে ডালে ডালে,
ঢেউ লাগে বিলে-খালে,
উড়ে যায় ধুলো-বালি
পথের উপর,
ওই এল ঝড়।

আশমানে জমে মেঘ—

কালো ঘুট্-ঘুট্—
তুফানের বাড়ে বেগ,
সে রে ছুট্-ছুট্
মাঝ-নদী ছেড়ে মাঝি
কূলে আনে তরী আজি,
কোথা যেন বাজ পড়ে
কড়্ কড়্ কড়্ ;
ওই এল ঝড়।



অনুশীলনী

১. মিল আছে এমন শব্দগুলো বেছে নিয়ে নীচে নীচে লেখো।
ঘুট্-ঘুট্, কড়্-কড়্, খালি খালি, ফুলগুলি, একতিল,
২. কবিতা থেকে নিয়ে শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসায়।
...হুল্লোড় লাগল। ...ঢেউ উঠল। ...ধুলোবালি উড়ল।
আকাশে... জমল। তুফানের... বাড়ল। মাঝি নোকাটি... নিয়ে এল।

মৌখিক

কবিতাটি সমবেত করে আবৃত্তি করো।

আমবাগানেতে গিয়ে
কাজ নাই আজ,
ডরে বৃক কাঁপে শূনে
ঝড়ের আওয়াজ
তালবনে খালি খালি
দেয় কে রে করতালি,
খেজুর—পাতায় বাজে
হাজার ঝঞ্জর—
ওই এল ঝড়।

ঝোড়ো-কাকে দেয় ডাক—
উড়ে যায় চিল,
ফাঁকা সে আকাশে নাই
ফাঁক একতিল।

বাগানের ফুলগুলি
ঝরে যায় বিলকুলই
নীড়-হারা বুলবুলি
কাঁপে থর থর—
ওই এল ঝড়।

ঘরে বসে চুপচাপ
থাকো না-এখন,
চুপ করে বসে দেখো
ঝড়ের মাতন—
ওপারে গ্রামের পরে
আকুল বাদল ঝরে,
জলছাঁবি ভেঙ্গে ওঠে
অতি মনোহর—
ওই এল ঝড়।



এভারেস্ট জয়

আধখানা চাঁদেরমতো ভারতের উত্তরদিক জুড়ে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। এই হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরের নাম এভারেস্ট। এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিচূড়া। এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল থেকে এভারেস্ট শৃঙ্গটি দেখতে পাওয়া যায়। চির তুষারে ঢাকা এই গিরিচূড়া। উষার আলো এভারেস্টের উপর পড়ে অপরূপ রঙের ছটায় চারিদিক ভরে দেয়।

দীর্ঘকাল ধরে এভারেস্ট মানুষকে হাতছানি দিয়েছে। সে যেন মাথা তুলে বলেছে—এসো তো মানুষ। দেখি, আমাকে জয় করো। মানুষ সেই আহ্বানকে গ্রহণ করেছে। বাঙালী বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার অন্ধ কষে এভারেস্টের উচ্চতা মাপে দিলেন। দেশ দেশ থেকে পর্বতারোহীরা জয় করতে এগিয়ে এলেন। কী দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে মানুষ। কত প্রাণ গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানুষই বিজয়ী হয়েছে। সর্বোচ্চ ঐ চূড়ায় মানুষের জয়ের পতাকা উড়েছে।

এভারেস্ট জয় করতে প্রথম অভিযান হয়েছিল ১৯২১ সালে। মানুষ এটি প্রথম জয় করে ১৯৫৩ সালের ২৯ মে। সৈয়দ শেরপা তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড হিলারি এই দুজন এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর অনেকবার এভারেস্ট জয় হয়েছে।

নেপালের নামচে বাজার থেকেই অভিযান শুরু হয়। সেখানে প্রথম তাঁবু ফেলা হয়। তারপর পাহাড়ী পথ বেয়ে খুব সতর্ক হয়ে ওপরে উঠতে হয়। সমতলের ওপর দিয়ে হাঁটা আর পাহাড়ী পথে চলার মধ্যে অনেক তফাত। কিছুটা ওপরে ওঠবার পর গাছপালা বা পাখির দেখা মেলে না। আরও ওপরে বাতাস হালকা হয়ে যায়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। দরকার হয় অক্সিজেনের। বিশাল বিশাল তুষারের চাঙড় কিংবা ঝুরঝুরে বরফের ওপর পা ফেলে ফেলে চলতে হয়। কুঠার দিয়ে তুষার কেটে পথ তৈরি করে নিতে হয়।

প্রথমবারের সফল অভিযানে আট নম্বর শিবির থেকে দুজন অভিযাত্রী তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড হিলারি এভারেস্টে পৌঁছেছিলেন। শেষের তাঁবুটা তাঁরা ফেললেন একটা সংকীর্ণ জায়গায়। তারপর ওপরে নীচে দুটো থাক করে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লেন।



সকালে উঠতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন। পা এত ভারী কেন? জুতো কোথায়? ঘূমের মধ্যে তাদের পায়ের জুতোর ওপর বরফ জমে গেল। প্রকৃতি যেন তাঁদের এভারেস্ট জয় করতে দেবে না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবেই। দুজনে স্টোভ জেদলে ঐ বরফ গলিয়ে ফেললেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। দাঁড় দিয়ে পরস্পরের পিঠ বেঁধে নিয়ে তাঁরা তুষার কেটে কেটে এগিয়ে চললেন। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু। কিন্তু সাহস আর মনোবল নিয়ে তাঁরা অবশেষে পৌঁছে গেলেন জয়ের শীর্ষে।

মানুষ জয় করল বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে।

অনুশীলনী

- একই অর্থের শব্দগুলো খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লেখো
 অপস্থাপ—..... (খুব সন্দেহ, কিরণ)
 ছটা—..... অপূর্ব
 আশ্রয়—..... আলো, ডাক, আগা,
 শীর্ষ—..... চূড়া, নিম্নগণ)
- এভারেস্ট কী ?
- এর উচ্চতা কত ?
- এই উচ্চতা কে কেমন করে মাপেছিলেন ?
- কারা প্রথম এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন ? কোন্ তারিখে ?
- পাহাড়ী পথে ওপরে উঠতে কী কষ্ট হয় ?

মৌখিক

- এভারেস্ট জয়ের প্রথম অভিযান কোন্ সালে হয়েছিল ?
- এভারেস্ট অভিযান কোন্ জায়গা থেকে শুরু হয় ?

লিচুচোর

নজরুল ইসলাম

বাবুদের ভাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া
বলি থাম্ একটু দাঁড়া !
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
গ্যাম্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গৌ যেই চড়েছি,
হোতো এক ডাল ধরেছি,



ও বাবা মড়াং করে
পড়েছি সড়াং জোরে !
পড়াবি পড়্ মালার ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড়ো নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দৃষ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুবি
একদম জোরসে ঠুসি !
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে তাওয়া চাগিয়ে কাপড়



লাফিয়ে ডিঙন্দ দেয়াল,
দেখি এক ভিটরে শেম্মাল
আরে ধ্যাং শেম্মাল কোথা
ভেলোটো দাঁড়িয়ে হোথা !
দেখে যেই আঁকে ওঠা !
কুকুরও জুড়লে ছোটা !
আমি কই কস্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড় !
'বাবা গো মাগো'—বলে
পাঁচিলের ফৌকল গলে



ঢুকি গে বোস্দের ঘরে,
 যেন প্রাণ আসলো ধড়ে !
 যাব ফের? কান মালি ভাই,
 চুরিতে আর যদি যাই !
 তবে মোর নামই মিছা !
 কুকুরের চামড়া খিঁচা
 সে কি ভাই যায় রে ভূলা—
 মালীর ঐ পিট্‌নিগুলা,
 কী বলিস? ফের হস্তা?
 তওবা—নাক-খপ্তা !



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করো :
- ভাড়া, মড়াং, কাঙে, মোহুসে, ধড়ে, হস্তা

মৌখিক

কবিতাটি আবৃত্তি করো।



মহিষে মানুষে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

একবার আমরা কয়েকজন মিলে সুন্দরবনে মহিষ শিকারে গিয়েছিলাম। পথে একটা খাল পার হতে হয়েছিল। সেখানে তালগাছের তৈরি একরকম ডোঙা পাওয়া যায়। তাতে কষ্টেস্কেট দু'জন লোক বসতে পারে। আমরা অতি কষ্টে খাল পার হলাম। একটা ঘাসবনের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হতে লাগলাম। সামনেই দেখি একদল মহিষ। সুযোগ দেখে একটাকে গুলি করলাম। মহিষটা মাটিতে পড়ে গেল। তখন দলের অন্য মহিষগুলো খেপে উঠে আমাদের তাড়া করল। আমরা তাড়াতাড়ি ডোঙায় উঠে গভীর জলে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবগুলি ডোঙাই উলটে গেল। বড়ো বিপদ। উলটানো ডোঙা ধরে কোনোক্রমে আমরা গভীর জলে এসে পড়লাম। মহিষগুলো অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে এসেছিল। অবশেষে জল গভীর দেখে রাগে শিঙ নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

মহিষের পাল চলে গেলে মৃত মহিষটার শিঙ আনবার জন্য আমি বাঁকা পথ ধরে তার কাছে উপস্থিত হলাম। মহিষটার লেজ ধরে আমি টানতে টানতে আনন্দে চিৎকার করে আমার দলের লোকদের ডাকতে লাগলাম। এমন সময় কী সর্বনাশ! মহিষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। শিঙ পেতে আমাকে গুলিতোতে এল।

লেজটা খুব শক্ত করে ধরে ছিলাম। তাই সে আমাকে গদ়তোতে পারল না। কিন্তু আমাকে নিয়ে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগল। হাত ছেড়ে গেলেই মৃত্যু। আমি প্রাণপণে লেজ ধরে তার সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। আমার মাথার টুপি উড়ে গেল। সঙ্গী লোকজন ভয়ে পালিয়ে গেল। আমি প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লাম। এমন সময় মহিষটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়লাম। ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকালাম। এবার সে সত্যিই মরে গেছে। সে যাত্রা আমি বেঁচে গেলাম।



অনুশীলনী

১. বন্ধনী শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের অন্য শব্দ বসানো :
আমি গাছের (আড়ালে) বানরটিকে দেখলাম। কাছে গিয়ে ওটাকে ধরার (অযোগ্য) খুঁজতে লাগলাম। (আন্তে আন্তে) (অগ্রসর হতে) লাগলাম। পেছনে একটা খরগোশ (তাড়া) করল।
২. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো :
(ধীরে ধীরে, দামনে অস্থির, সোজা)
তাড়াতাড়ি—, পেছনে—, ঝাঁক—, স্থির—।
৩. লেখক কী জন্তে হস্তবনে গিয়েছিলেন ?
৪. তিনি কীসে করে খাল পার হলেন ?
৫. তিনি কোথা থেকে মহিষটাকে গুলি করেছিলেন ?
৬. দলের অন্য মহিষগুলো তখন কী করল ?
৭. লেখক আবার মহিষটার কাছে গিয়েছিলেন কেন ?
৮. গৃহপালিত মহিষ মানুষের কী কী উপকার করে ? (পাঁচটি বাক্যে লেখো।)

মৌখিক

১. হস্তবন কোথায় ?
২. হস্তবনের বিখ্যাত বাঘের নাম কী ?

বিদ্যাসাগর



নাম তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু লোকে তাঁকে বিদ্যাসাগর নামেই বেশি চেনে। ঈশ্বরচন্দ্র বড়োদুঃখ কষ্ট সহ্য করে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন।

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বড়ো অশান্ত ও একগুয়ে। কারো আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করতেই তিনি ভালোবাসতেন। লোকে তাঁর দৌরাতেয়া অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু

পড়াশোনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। ওই একগুয়েমি নিয়েই তিনি পড়াশোনা বা যে কোনো একটা কাজ হাতে নিয়ে শেষ না করে ছাড়তেন না।

গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। ন বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কলকাতার বাসায় নানা অসুবিধা আর দারিদ্র্যের মধ্যে বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে তিনি বাস করতেন। বাজার করা, বাটনা বাটা, উনান ধরানো, রান্না করা, বাসন মাজা সবই তাঁকে করতে হত। রান্না করতে করতে আর স্কুলে যাবার পথে তিনি পড়া তৈরি করতেন। সব অসুবিধার সঙ্গে বাল্যের সেই দাবুণ জেদ নিয়ে যুদ্ধ করে একুশ বছর বয়সে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

পড়া শেষ করে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক হন। এই সময় তিনি ইংরেজি শেখেন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হন। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন।

তখন এদেশে শাসন করত ইংরেজরা। এদেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তোলবার ব্যবস্থা তিনি করতে লাগলেন। মেয়েদের শিক্ষার দিকে তখন পর্যন্ত তেমন কারও নজর ছিল না। এখানেও এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তিনি প্রথমে নিজের গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরে তাঁরই চেষ্টায় চারটি জেলায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'বর্ণ-পরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়', এইসব পাঠ্য বই রচনা করলেন। এইভাবে দেশের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি শিক্ষার প্রসার ঘটালেন।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগরও ছিলেন। অপরের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলে মনে করতেন। পঙ্গু, অক্ষম, রোগী, দুঃখীকে রাস্তা থেকে তুলে এনে তিনি হোমিওপ্যাথি প্রথায় চিকিৎসা করতেও শিখেছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের একদিনের একটা ঘটনা শোনো।—

বিদ্যাসাগর বর্ধমান শহর থেকে হেঁটে চলেছেন কালনার পথে। সঙ্গে রয়েছেন গিরীশচন্দ্র বিদ্যারঙ্গ। কালনায় তাঁরা জরুরী কাজে চলেছেন। থমকে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। রাস্তার পাশে একজন পাখিক পড়ে আছে। তার কলেরা



হয়েছে। কাপড়-চোপড় ময়লামাখা। তার দেহেও ময়লা। পথে কত লোক চলছে। কিন্তু সকলে নাকে মুখে কাপড় দিয়ে সরে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর দ্রুত এগিয়ে রোগীকে কাঁধে তুলে নিলেন। তাকে কাঁধে নিয়ে আশ ঘণ্টা হেঁটে কার্লনা হাসপাতালে এলেন। সাহেব ডাক্তারকে ডেকে বললেন, “ডাক্তার, একে বাঁচাতেই হবে। কথা দিন ভালো চিকিৎসা হবে।” ডাক্তার একটু বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, “চিকিৎসার চুটি হবে না। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে আপনি কে?” বিদ্যাসাগর বললেন, “আমি এমন কেউ নই। লোকে আমাকে বিদ্যাসাগর বলে।” ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। সে দিনটি ছিল সমগ্র জাতির কাছে শোকের দিন।

অনুশীলনী

১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের শব্দ এই বচন থেকে বেছে নিয়ে বসানো :
শৈশবে অনেক ছেলেই (দুঃস্থ) থাকে। কেউ কেউ হয় (অবাধ্য)। কারো কারো (দুঃস্থপনায়) অনেকে বেগে যায়। কারো কারো কাজে (টিলেমি) দেখা যায়। অনেকের দিন কাটে (অভাবের) মধ্যে। তবু অনেকে পড়াশোনায় বেশ (পটু) হয়ে ওঠে। (খোঁড়া), (দুর্বল) দেব সাহায্য করার জগ্ন ছোটোরাই এগিয়ে আসে। রোগীর (সেবা) করতে তারা উৎসাহী হয়।
২. বিদ্যাসাগর তঁা উপাধি ; তাঁর নাম কী ?
৩. শৈশবে পড়াশোনার সময় তাঁকে কী কী অধ্যয়ন ভোগ করতে হয়েছিল ?
৪. বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্য বইগুলির নাম লেখো।
৫. তোমার পাঠ্য বইগুলির নাম লেখো।
৬. ডাক্তারকে বিদ্যাসাগর কী বলেছিলেন ?

অধিক

১. বিদ্যাসাগরের রোগী-সেবার ঘটনা বলো।
২. শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনের আরো দু-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুনে নাও।

দামোদর শেঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপেক্ষেতে খুঁশি হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়াকর মোয়া চাই, চাই ভাজা, ভেটকি।
আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?
চিনেবাজারের থেকে এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
না হয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি?
মনে রেখো, বড়ো মাপেকরা চাই আয়োজন-
কলেবর খাটো নয়, তিন মৌন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কী॥



অনুশীলনী

১. কবিতাটিতে কী কী খাবারের নাম আছে, লেখো।

মৌখিক

১. জলপাইগুড়ি ও কইয়া কোথায়?
২. কবিতাটি আবৃত্তি করো।

ডানপিটে

সুকুমার রায়



বাপুরে কী ডানপিটে ছেলে!—

কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাই ঠাই শিশি ভাঙে স্লেট দিয়ে ঠুকে।
অনাটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ করে দুম্‌দাম্‌ পড়ে!

বাপুরে কী ডানপিটে ছেলে!—

শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘষে,
একমনে মোমলাতি দেশড় চোষে!



আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্‌ কপ্‌ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে!

বাপুরে কী ডানপিটে ছেলে!—

খুন হত টম্‌ চাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহে শূঁকে বড়ো মুখে নাহি ভোলে,
রেগে ভাই দুই ভাই ফোঁস ফোঁস ফোলে।
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ বাপ বলে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো।
ঠাই ঠাই, দুম্‌ দাম, টোম টোম
২. কে কী বকম শব্দ করে?

গোড়। টিকটিকি। কড়। নদী বেড়াল। শটক। বেলাঘাতি। কানামাছি

মৌখিক

কুমিরের খিদে

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য



কুমিরের চোয়ালে ভীষণ জোর। কুমিরের দাঁতে ভীষণ ধার। চোয়ালের এক চাপে সে যে কোনো জন্তুর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আর এক কামড়ে সে মানুষের একটা পা উরুর নীচ থেকে কেটে নিয়ে যেতে পারে। তবে সে দাঁত দিয়ে চিব্বেনো যায় না। এই জন্য কুমির ছোটো ছোটো শিকার একরকম গিলেই খায়। বড়ো বড়ো জন্তু হলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে হয়। এই জন্য শিকার ধরে কুমির তাকে জলের মধ্যে প্রমাণ্যত মোড়ড় দিতে থাকে। মোড়ড় খেয়ে খেয়ে শিকার অসাড় হয়ে পড়ে। তখন তাকে দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু সময় সময় তাতেও অসুবিধে। এইজন্য কুমির টাটকা মাংসের চাইতে একটু বাসি মাংস পছন্দ করে। তাই কখনও কখনও শিকারকে নদীর ধারে কোনো গর্তে লুকিয়ে রাখে। কুমিরের এই স্বভাবের জন্যই কুমিরের হাত থেকে অনেক মানুষ নিষ্কৃতি পেয়েছে। কুমির মানুষ ধরে তাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে ছেলে। তারপর কুমির চলে গেলে মাটি সরিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়ল।

কুমির প্রায় সর্বভক্ষক। সুবিধে পেলে কোনো জন্তুই খেতে ছাড়েনা। আর পারলেই সে গিলে খায়। এই গিলে খাবার একটা ঘটনা শোনো। একবার আফ্রিকার টাঙ্গানিকায় এক ইংরেজ শিকারি একটা কুমির শিকার করলেন। তার পেট চিরে শিকারি তো অবাক। পেটের মধ্যে ১১টা পেতলের বাল, ৩টে আর্মলেট, মানুষের হাতের আর পায়ের ১৪টা আস্ত হাড় এবং কয়েক গজ শব্দ দাড়ি পেলেন। ঐ কুমিরটা বেশ কয়েকটি কান্ডি মেয়ে আর পুরুষকে আস্ত খেয়েছিল। ওগুলো তাদেরই গয়নাগািটি। দাড়িটি দিয়ে সম্ভবত কোনো মোট বাধা ছিল। কুমির সেটাও বাদ দেয়নি। খাবার হজম করবার জন্য কুমির খেয়ে দেয়ে ছোটো ছোটো গোল গোল নুড়ি পাখর গিলে ফেলে। নুড়ি পাখরগুলি পেটে গিয়ে নড়াচড়া করে করে খাবার পিষে নরম করে দেয়। তাতেই কুমিরের হজমের সুবিধা হয়। কিন্তু পেতলের গয়না আর দাড়ি, হাড় হজম করা তো সহজ কথা নয়। তাই ওগুলো পাকস্থলীতেই রয়ে গিয়েছিল।



অনুশীলনী

১. বহনীর শব্দভাণ্ডার বসলে একই অর্থের শব্দ গুলি থেকে ঝুঁজে নিয়ে বসাদ :
সে (অবিবাহিত) সীতার কেটে ভাল। কুমির (সব খায় এমন) জন্তু।
সে একটা (সোটা) আনারস খেয়ে ফেলল। লোকটি (বোম্ব হার) আমাকে চেনে।
২. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো—যেমন : নীচ—উপর।
শাও—। প্রকৃতি—। বাধা—। ছোটো—। নরম—। সহজ—।
৩. কুমির কেমন মাস খেতে পছন্দ করে ?
৪. কুমির গিলে খায় কেন ?
৫. টাঙ্গানিকায় কুমিরের পেটের রসো কী কী পাওয়া গিয়েছিল ?



কুমিরের মতো দেখতে কোন জীব বা ক্রীড় দেখালে দেখতে পাও ?
সে কি কবে শিকার করে লেখে।

সৌধক

১. কুমিরের মতো জন্তু কীভাবে খায় ?
২. কুমির বড়ো জন্তু কীভাবে খায় ?
৩. কুমির ভাত, মাংস, ডাল কীভাবে খায় ?

ফুটেফুটে জোছনায়

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটেফুটে জোছনায় জেগে শূন্য বিছানায়
বনে কারা গান গায় ফিমিফিমি কুম্‌কুম্‌।
চাও কেন পিঁচিপিঁচি, উঠে পড়োলক্ষ্মীটি!
চাঁদ চায় মিটিমিটি, বনভূমি নিককুম্‌!
ফাল্গুনে বনে বনে, পরীরা যে ফুল বোনে।
চলে এসো ভাইবোনে, চোখ কেন ঘুম্‌ঘুম্‌?



অনুশীলনী

১. নীচের শব্দগুলির মধ্যে মিল আছে এমন শব্দগুলো কবিতা থেকে বেছে নিয়ে নীচে লিখে দেখো।
জোছনায় পিঁচিপিঁচি নিককুম্‌
.....
২. কবিতা থেকে ঠিক আগের—শব্দগুলো বেছে নিয়ে পূরণে বসানো।
.....জোছনায়। চাও। বনে বনে।

ছবি

মৌখিক

কবিতাটি আবৃত্তি করো।

.....

দেশরক্ষা

বহুদিন আগেকার কথা। তখন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই গৌড়-এর পাল রাজবংশ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা রামপাল। একদিকে গঙ্গা—অপরদিকে করতোয়া নদী—মধ্যখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। নাম তার রামাবতী।

রামপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র কুমারপাল গৌড়ের রাজা হলেন।

তার প্রিয় বন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বৈদ্যদেব। কুমারপালের চেয়েও এই বৈদ্যদেবের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

কুমারপাল রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপের রাজা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বৈদ্যদেব তাকে পরাজিত করে ফিরে এলেন। রামাবতী রাজপ্রাসাদে চলল বিজয়োৎসব। সবাই তখন বিজয়-উৎসবের আনন্দে মত্ত। এমন সময় এক দুঃসংবাদ এল। কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মী সৈন্যদাম্পত্য নিয়ে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন। স্থলপথে, জলপথে দুই পথেই কলিঙ্গ সৈন্য আসছে।

বৈদ্যদেব স্থলপথে অনন্তবর্মীকে বাধা দিলেন। কলিঙ্গ সৈন্যরা পিছু হঠল। অনন্তবর্মী তখন জলপথে সৈন্যসংখ্যা বাড়ালেন। তারপর নিজেই সেই সৈন্যদের পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু রামাবতীর পথ তার ভালোভাবে জানা ছিল না।





এমন সময় একটি লোক এসে রাজা অনন্তবর্মার কাছে কিছু সাহায্য চাইল। লোকটির অনেক বয়স। মাথার চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু চেহারা বাল্য। সে হাতজোড় করে বলল,—“মহারাজ, আমি এক দরিদ্র ভিক্ষুক। আমাকে কিছু সাহায্য করুন।” রাজা বললেন,—“তুমি সোভে বাস কর?” “হাঁ মহারাজ।” কিন্তু একটা কথা। আমি সোভাবাজারে অগ্রসর হয়েছি। পথ ভালো চিনি না। তুমি আমাকে রামাবতীর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। সোভ জয় করে তোমাকে একটা জমির রাজা করে দেব।” লোকটি বলল,—“রাজা হবার লোক আমার নেই, মহারাজ। সামান্য কিছু সাহায্য পেলেই আমি খুশি।” রাজা এবার অসন্তুষ্ট হলেন। বৃদ্ধ নরম হয়ে বলল,—“আম্বা, আমি পথ দেখাব। আমাকে একখানি নৌকা দিন, দুজন চালক দিন। আমি আগে আগে চাই হব। লোকটি নৌকা চড়ে পথ দেখাতে লাগল। নৌকাধীনীর কণ্ঠে সাহায্য করছে। এর সহযোগে সে সোভ জয় করবে।

বৃন্দের নৌকা তীরবেগে ছুটে চলেছে। এ-বাক সে-বাক করে নৌকা এগিয়ে চলেছে। আর নৌবাহিনী তার অনুসরণ করছে। সৈনিকরাও উৎসাহে উদ্দীপ্ত। আর কতদূরই বা রামাবতী!

হঠাৎ নদীর একটা বাক ফিরতেই বৃন্দের নৌকাটি হারিয়ে গেল। নৌবাহিনীর আগের নৌকাতে ছিলেন রাজা অনন্তবর্মা। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কোথায় সেই গোড়বাসী বৃন্দ? কোথায় নৌকা?

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেখলেন—তার সম্মুখে গোড়ের রাজার বিশাল নৌবাহিনী। দেখতে দেখতে সেই নৌবাহিনী কলিঙ্গরাজের নৌবাহিনীকে ঘিরে ফেলল। তুমুল যুদ্ধ হল। অনন্তবর্মা পরাজিত হলেন। তাঁর নৌবাহিনী নদীর জলে ডুবে গেল, বন্দী হলেন কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা।

বন্দীকে আনা হল রামাবতীর রাজ-দরবারে। বন্দী অনন্তবর্মা বিস্মিত হয়ে দেখলেন—রাজ-দরবারে রাজার পাশে বসে সেই বৃন্দ ভিক্ষুক।

হেসে ফেললেন বৃন্দ ভিক্ষুক। বললেন, “আমায় চিনতে পারলেন কলিঙ্গরাজ?”

কুমারপাল বললেন,—“আমিই চিনিই দিচ্ছি। ইনি আমার প্রধানমন্ত্রী। বৈদ্যদেব। ইনি মন্ত্রী এবং বৃন্দ এবং ইনিই আমার সেনাপতি। ইনিই গোড় রাজ্যের গৌরব।”

অনন্তবর্মা সব বুঝতে পারলেন। লজ্জায় মাথা নত করলেন।

অনুশীলনী

১. একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো। এর মত বইয়ের শেষে অভিধান দেখো।

যেমন :—বিশাল—	বিরাট—	অগ্নসংগ—
স্থাপন—	মস্ত—	উদ্ধীর্ণ—
প্রধান—	পিছু—	বিস্তৃত—

২. রামাবতী কোন দেশের রাজধানী ছিল?

৩. যুদ্ধটি কোথায় হয়েছিল?

৪. এ যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিল?

৫. বৈদ্যদেব কীভাবে স্বদেশ বন্ধা করেছিলেন?

মৌখিক

১. এ যুদ্ধে কোন ঘনি ব্যবহার করা হয়েছিল?

২. বর্তমানে যুদ্ধে কোন কোন ঘনি ব্যবহার করা হয়? কয়েকটির নাম বলো।

৩. স্বদেশ বন্ধার মত গ্রাম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন এমন কয়েকজন ভারতবাসীর নাম বলো।



গাছপালা আর নদীর জল

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছপালা নদীর জল,—এদের একের সঙ্গে অন্যের নিবিড় সম্পর্ক। কথাটা শুনেলে হয়তো অবাক হবে। নদীর জলের সঙ্গে আবার গাছপালার সম্পর্ক কী? গাছপালা তো আর নদীর মধ্যে নেই। গাছপালা রয়েছে নদীর দু-ধারে, পাহাড়ের গায়ে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে গাছপালার সঙ্গে নদীর জলের সম্পর্কটা কত গভীর।

বৃষ্টি শুরু হলে মাটির ওপর দিয়ে জল গাড়িয়ে গিয়ে পড়ে ছোটো ছোটো নালাতে, আর তারপর গিয়ে মেশে বড়ো বড়ো নদীতে। এভাবেই নালার জল গিয়ে পড়ে নদীর জলে, আবার নদীর জল লীন হয়ে যায় সাগরের জলে। কিন্তু বৃষ্টির জল যদি মাটিতে পড়বার আগেই গাছের পাতা, ডালপালা এসবের ওপর ফলে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণও অনেক কম হয়। কাজেই বনজঙ্গলের চাইতে ন্যাড়া গিয়ে পড়ছে ছোটো ছোটো নালাতে, আর তারপর বড়ো বড়ো নদীতে। ন্যাড়া জায়গায় এর ওপর খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেল। এই নদীনালা বৃষ্টির সবটা জল বায়ে যায়। বন্যা আসে। কিন্তু গাছপালা থাকলে মাটির ক্ষয় কম হবে। অমন অঘটন কম ঘটবে। এই জন্য মানুষ কখনো থাকে গাছপালার কাছে।

এতো ঝগল বন্যার কথা। কিন্তু খরার কথাও একটু ভাবা দরকার। খরার নদী-নালা কুয়ো সব শুকিয়ে যায়, চাষের জমি ফেটে যায়। মানুষ হাহাকাঙ্ক শুরু করে এক ফোঁটা জলের জন্য। কিন্তু কেন এমন হয়? তার কারণও সেই গাছপালার অভাব। মাটি বৃষ্টিতে ধরে রাখতে না পারলে সে জল তো নদীনালা বেয়ে গাড়িয়ে মাগিয়েই চলে যাবে। তাছাড়া গরমে অনেকটা জল তো বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে। মাটি শুকনো হয়ে পড়বে। তাহলে এভাবে মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কী দরকার? সেই গাছপালা। গাছপালাই বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে। গাছপালাই মাটিকে ঠান্ডা রাখতে পারে।

আর-একটা কথাও বলে রাখা ভালো। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের ধারা গাড়িয়ে যেতে চায় নীচের দিকে, নালার দিকে। কিন্তু গাছপালার মধ্যে জল খুব তাড়াতাড়ি গাড়িয়ে যেতে পারে না। গাছের শেকড়ে বাধা পায়। তখন ওই জলের কিছুটা অংশ মাটিতে ঢুকে যায়। এটা কি লোকসান? না, প্রায় পুরোটাই লাভের খাতায় জমা পড়ল। এই জল মাটির নীচে গিয়ে একটু একটু করে মাটির দানাগুলির ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে যায়। কিন্তু যেতে যেতে যদি বাধা পায়? তখন ক্রমে পাশের দিকে চলতে শুরু করে। তারপর কোনো ঢাল, জায়গায় মাটির গা বেয়ে বেরিয়ে নালায় এসে মেশে। বৃষ্টির জলের অনেকটাই এভাবে ধীরে ধীরে মাটির নীচে দিয়ে বয়ে এসে নদী আর নালায় পড়ে। অনেকটা জায়গা গাছপালা জঙ্গলে ঢাকা থাকলে সেসব জায়গার নদী আর নালাগুলিতে তাই সারা বছরই একটু-আধটু জল থেকেই খয়-একেবারে শুকিয়ে যায় না। মানুষের প্রাণও তাই বেঁচে যায়।



এসব কথা ভেবে দেখলে মনে হয়,—গাছপালাই মানুষকে জল দিচ্ছে, গাছ-পালাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গাছপালা না থাকলে গোটা দেশটা মরুভূমি হয়ে যেত।

গাছপালা তো মানুষের জন্য এত করছে। আর মানুষের কি কোনো কতখানি নেই গাছপালার প্রতি? আছে বইকি! মানুষ পারে গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে: চারাগাছ পুতে গাছের সংখ্যা বাড়াতে। গাছের সংখ্যা বাড়লে তাতে মানুষেরই প্রাণ বাঁচবে। আমাদের দেশটি সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে। দেশের চেহারাও বদলে যাবে।



অনুশীলনী

১. বৃক্ষমণ্ডল শব্দগুলোর বদলে একটি অর্থের শব্দ এটি বসনা থেকে বেছে নিয়ে বসান।
নদীর সঙ্গে মাছের (মজার) সম্পর্ক। কখাটা জনলে (বিখিত) হয়ে হয়।
নদীর জল না থাকলে চারসিকে (আত্মনাশ) পড়ে যায়। নদী-ও গাছ দেশের (আকৃতি)
(পরিবর্তন করে) দিতে পারে।
২. খরায় কী অসুবিধা হয়?
৩. গাছপালা থাকার কী সুবিধে?
৪. গাছের সংখ্যা বাড়লে মাছের কী উপকার হবে?
৫. ভোমার পরিচিত একটি গাছ সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. কুটির জল কোথায় গিয়ে পড়ে?
২. নদীর জল শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়?
৩. মাটির জল কখনো কী করে?
৪. ভোমার পরিচিত পাঁচটি গাছের নাম লেখো।

প্রদীপের বকুরা



প্রদীপের পড়ার ঘর। ঘরের দেয়ালে ভারতের মানচিত্র। মানচিত্রটির দিকে তাকাতাই প্রদীপের চোখে ভেসে ওঠে একটি উৎসবের ছবি।

সেবার কলকাতার শিশু উৎসব হলে গেল। নানা জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল। দিল্লি কাম্মীর, রাজস্থান, আসাম, বোম্বাই, কেরল—এক একটি রাজ্যের এক একটি দল। উৎসব-প্রাঙ্গণে বিরাট এক মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে ভারতের বিশাল এক মানচিত্র। তাতে আঁকা ছিল যত রাজ্যের ছেলেমেয়ের ছবি।

পদা উঠলে দেখা গেল তাদের। পরনে নিজস্বের অঞ্চলের পোশাক। তারা নাচল, গাইল, আবৃত্তি করল, অভিনয় করল। আনন্দে ভরে উঠল সকলের মন।

পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের দলে ছিল প্রদীপ। ধূতি-পাজামিতে ছোট প্রদীপকে ভারি-সুন্দর দেখাচ্ছিল। উৎসবে কত জনের সঙ্গে বন্ধু হ'ল তার। তার একটি ছোটো খাতা আছে। নানা রাজ্যের বন্ধুরা তাদের নাম আর ঠিকানা লিখে দিয়েছে পাতার পাতার। প্রদীপ খাতাটি খুলল। খাতা খুলতেই মনে পড়ে গেল বন্ধুদের কথা।

প্রথম পাতাতেই প্রেমনাথের নাম। ওদের বাড়ি দিল্লি। প্রেমনাথ বলেছিল—ছুটিতে চলে এসো আমাদের বাড়ি। বাবার সঙ্গে আমি তোমাকে দিল্লি ঘুরে দেখাব। সকালে উঠে চাপাটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা।

—চাপাটি?

—তোমরা ভাত খাও। আমরা চাপাটি খাই।

—দিল্লিতে অনেক কিছুর দেখার আছে? না?

অনেক কিছুর। রান্ধুপাতি ভবন, পার্লামেন্ট হাউস, ইণ্ডিয়া গেট, মস্তুরমস্তুর, কুতুব মিনার। নতুন দিল্লির ছায়াভরা রাজপথ দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

—পুরনো দিল্লিও আছে নাকি?

—নেই আবার? বিখ্যাত লাল কেল্লা তো পুরনো দিল্লিতে।

প্রদীপ বলেছিল—গরমের ছুটিতে যাব। বাবাকে বলব।

প্রেমনাথ বলেছিল—গরমের ছুটিতে এসো না। তখন দিল্লিতে ভীষণ গরম। পুজোর ছুটিতে এসো।

পরের পাতায় মমতাজের নাম। কাশ্মীরী দলের মমতাজ। নৌকা-নাচে সে মাঝি হয়েছিল। কাশ্মীরে বাড়ি। তাদের অনেকগুলো ভেড়া আছে। ওর মা ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরি করেন। মমতাজ পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মা-র কাজে সাহায্য করে। ওর বাবা একটি হাউজ-বোট দেখাশোনা করেন।

হাউজ-বোট—কথটা প্রথম শুনল প্রদীপ।

মমতাজ ব্যাখ্যা দিল। হাউজ-বোট মানে নৌকাবাড়ি। দুদের জলে ভেসে থাকে সুসজ্জিত নৌকা। নৌকাতেই রান্নাবান্না। নৌকাতেই থাকার জায়গা।

—ভারি মজা তো।

—ভারি মজা। কাশ্মীরে অনেক পর্যটক বেড়াতে যায়। অনেকে দু-চারদিন নৌকাবাড়িতে কাটিয়ে দেয়।

মমতাজ প্রদীপকে বলল—তুমি চলো—না কাশ্মীরে। দেখবে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত ফুল। কত গাছ সার বোঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কাশ্মীরে এলে তুমি অনেক আপেল খেতে পাবে।

মমতাজের ফরসা টুকটুকে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলেছিল—যাব।

মনে পড়ে যায় প্রতাপকে। রাজস্থানী দলের প্রতাপ। ভারি ছটফটে। মাথায় পাগাড়ি বোঁধে মগ্ধে এসেছিল। যোধপুরের একটি গ্রামে থাকে ওরা। ওদের বাড়িতে উট আছে। প্রতাপ উটে চড়েছে।

উটের নাম শুনে প্রদীপের কৌতূহল হল।

প্রতাপ বলেছিল—আমাদের যোধপুরের একটা দুরেই থর। থর মরুভূমি। ওখানে লোকেরা উটে চড়েই যাতায়াত করে। উট হল মরুভূমির জাহাজ। তুমি যোধপুরে এসো। তোমায় উটে চড়াব।

একটি পাতায় রামনের নাম। রামন ছিল কেরলের দলে। ওর বাবার সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা।

—তুমি মাছ ধরতে পার?

—দু-একবার বাবার সঙ্গে নৌকায় করে গিয়েছি। সমুদ্রের ঢেউ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

রামন পেন্সিল দিয়ে একে দিয়েছে তাদের বাড়ির ছবি। বাড়ির চারদিকে নারকেল গাছ। একটা দুরেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জল। বাড়ি থেকে দেখা যায় সমুদ্রে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। রামন বার বার করে প্রদীপকে তাদের বাড়ি যেতে বলেছে।

লীলারা থাকে অস্ট্রেলিয়া। ওদের ওখানে তুলোর চাষ হয় খুব। লীলাদের দল উৎসবে তুলো তোলায় নাচ দেখাল। সবার পিঠে ছোটো ছোটো কুড়ি। নাচের মাঝে মাঝে মগ্ধে ছাড়িয়ে দিচ্ছিল সাদা সাদা তুলো। নাচের শেষে প্রদীপ বলেছিল—তোমাদের নাচ চমৎকার হয়েছে, লীলা। নাচটা আমার শিখিয়ে দেবে? লীলা বলেছিল—হ্যাঁ, দেবে। আগে তুমি আমাদের বাড়ি চলো।

খাতার পাতায় আরেকটি নাম—মনসুর আলি। ওরা থাকে বিহারে। ঝরিয় কয়লাখানিতে কাজ করে ওর বাবা। মনসুর ভালো বাঁশি বাজাতে পারে। ওদের দল একটি সাপুড়ে নৃত্য দেখিয়েছিল। মনসুর বাজিয়েছিল সাপুড়ে বাঁশি। যাবার সময় সে প্রদীপকে একটি সাপুড়ে বাঁশি দিয়ে গিয়েছে।



জয়মলপলকে মনে আছে প্রদীপের। আসামের দলের জয়মলপল। সবাই ডাকে জয়। আসামের একটি চা-বাগানে ওদের বাড়ি। ও প্রদীপকে বলোঁছিল চা-বাগানের কথা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ চা-গাছ। ছবির মতো সুন্দর। জয়মলপলরা নোঁচোঁছিল বিহু নাচ। বিহু ওদের বড়ো উৎসব। উৎসবের শেষ গানটি ছিল সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত। প্রায় দুশো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গাইল সেই গান। দশকৈরাও গম্বা মেলায় তাদের সঙ্গে। সেই দুশা প্রদীপ কখনো ভুলবে না।

মাবার সময় বন্ধুরা তাকে নানা জিনিস উপহার দিয়েছে। প্রদীপ দিয়েছে একটি করে বাকুড়ার পুতুল-ঘোড়া। ঘোড়ার গলার বাঁধা এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা আছে—বন্ধুকে দিলাম। প্রদীপ।



অনুশীলনী

১. লেখাটি থেকে শূন্যস্থানে একটি করে উপযুক্ত শব্দ বসাতো :

—উৎসব, —প্রাঙ্গণ, —স্বন্দর, —ভবন, —কেলা, —গুহন, —নৌকা—, —জাহাজ,
—চেউ—পুতুল

২. বন্ধুর শব্দগুলো নীচের শূন্যস্থানে বসিয়ে একটি অর্থহীন বর্ণনা লেখো :

(শিত্তি বিবস, অর্থহীন, অর্থহীন যোগদান, উল্লেখ্য-সঙ্গীত, সাপকে বুকা, শিত্তিশিল্পী,
জাতিগোষ্ঠি গানের, হাঙ্গ কৌতুক, মজার, আকর্ষিত, সমবেত কণ্ঠ) —উপলক্ষ্যে সেদিন আমতা
একটি—করেছিলাম। অনেক ছেলেমেয়ে—করেছিল। প্রথমে—হল। তারপর
একটি—। এরজন—বাঁশি বাজিয়েছিল। —সঙ্গে নেচেছিল একজন মেয়ে। দুটি
ছেলের—জাবি—হয়েছিল। মজারকণ্ঠে কবিতা—কলে চারজন ছেলেমেয়ে। সবশেষে
হয়েছিল—মহানি-সঙ্গীত।

৩. পাশের প্রাঙ্গণে বা শব্দের অর্থ বা অর্থ কোথাও দিয়ে একটি বন্ধুর সঙ্গে তোমার আশঙ্ক
হয়েছে। তার সঙ্গে কত কণ্ঠে পাঁচটি বাক্য লেখো।



সমব্যথী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেন কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে বাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সাঁতা করে বল,
আমায় করিস নে, মা, ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোমার হাতে,
আমি খাব না তোমার পাতে॥





যদি খোকা না হয়ে
 আমি হতেম তোমার টিয়ে
 তবে পাছে যাই, মা, উড়ে
 আমার রাখতে শিকল দিয়ে?
 সতি করে বল,
 আমার করিস নে, মা, ছল—
 বলতে আমার 'হতভাগা পাখি,
 শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
 তবে নামিয়ে দে মা,
 ভালোবাসিস নে মা।
 আমি রব না তোর কোলে,
 আমি বনেই যাব চলে॥

অন, শীলিনী

১. মিল দাঁও :

এক যে ছিল টিয়ে।

জোরেব বেলা অনেক কথা

কইত সে শিস—।

এমনি ভালো পাখি—

তাই তো খাঁচা বিলাম খুলে

ভুল করেছি—?

সকলের তরে সকলে আমরা



জন্মাবার পর মানুষ কত অসহায় অবস্থায় থাকে। সে হটিতে পারে না। কেউ হাত ধরে তাকে হটিতে শিখিয়ে দেন। খিদে পেলে মা তিক সময় খাইয়ে দেন। ঠাণ্ডা লাগলে তিনিই তা বন্ধতে পারেন। সপো সপো তিনি গায়ে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে দেন। বড়ো হবার পথে প্রতি পদে মানুষের অপরের সাহায্য দরকার। না বারা তো আছেনই। দাদা দাদি সবাই সাহায্য করেন।



বড়ো হলে বন্ধুরা সাহায্য করে। প্রতিবেশীরা সাহায্য করে। সবার সাহায্য নিয়ে সবাই বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য চাই খাদ্য। কৃষকরাই এই খাদ্য উৎপাদন করে। পরবার জন্য জামাকাপড় চাই। তাতে, মেশিনে শ্রমিকরা এই কাপড় তৈরি করে। বসবাস করবার জন্য বাড়ি-ঘর চাই। তাতে, মেশিনে শ্রমিকরা এই ঘরামি, দিনমজুর। পাকা বা ইঁটের বাড়ি তৈরি করে রাজমিস্ত্রি। কাঁচা বাড়ি তৈরি করে গলারশলা তৈরি করে দেয় নানা শ্রমিক নানাভাবে। আবার এসবের জন্য পাত, পাইপ, লোহার নানা জিনিসপত্র, ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র।



কাঁচা বাড়ি হলেও তা তৈরির জন্য বাঁশ, খড়, মড়ি, মাটির জোগান দিচ্ছে কত লোক। আমাদের বাতায়নের রাস্তা তৈরি করেছে শত শত শ্রমিক মিলে। সকলে মিলে সেই রাস্তায় হাটছি। শিক্ষক ছাত্রদের পড়িয়ে মানুষ করছেন। ডাক্তার চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। ডাকঘর থেকে কত লোকের চেষ্টায় চিঠিপত্র আসছে যাচ্ছে। এইভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষ মানুষকে সাহায্য করে চলেছে।

একে অপরকে সাহায্য করার জন্য মানুষ একতর হয়েছে। তারা সমাজ গড়েছে। এই সমাজকে আবার সকলের জন্য সুখী সমাজে পরিণত করতে মানুষ কতই না লড়ছে।



যত মানুষ তত কাজ। সমাজের সব মানুষ এক কাজ করে না। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ বেছে নেয়। এইভাবে কাজ বেছে নেওয়াকে বলে জীবিকা অবলম্বন। তোমরাও বড়ো হলে এক-একজন এক-একটা জীবিকা অবলম্বন করবে। সব জীবিকার ধরন কিন্তু এক নয়। আকাশে যে বিমান চালায় তার বিপদ পড়ে পড়ে। আবার গভীর সমুদ্রে যারা মাছ ধরে, খনিতে যারা কাজ করে তাদেরই কি বিপদ কম।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু আমরা একে অপরকে সাহায্য করে চলছি। আমরা এইভাবে নিজেরা বেঁচে থাকি এবং অপরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করি। এই পৃথিবীটা কত সুন্দর। কত সম্পদ রয়েছে পৃথিবীতে। আমরা সকলে মিলে এই সম্পদ ভোগ করতে পারলে কতই না সুখে থাকতে পারি।



অনুশীলনী

১. বন্ধুত্ব শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের আবেগী শব্দ বসানো :
মাগুব আর আর (অসহায়) নয়। কেউ কেউ শব্দে তার (প্রতিবেশী)-রা এগিয়ে আসে। মাগুব নিজের ব্যক্তি নিয়ে (উৎপাদন) করতে পারে। সব মাগুবের (জীবিকা) এক নয়।
২. কেন্দ্রীভাবে মাগুবকে সাহায্য করেন ?
মা, ভবক, হাজমিরি, শিক্ষক, ডাক্তার
৩. খেলতে গিয়ে তোমার বন্ধু পা কেটে গেল। তুমি কী ভাবে তাকে সাহায্য করবে ? এ সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

চড়ুইটি

প্রমোদ মিত্র

চড়ুই, চড়ুই চড়ুইটি

ফুড়ুং ফুড়ুং ওড়ে

কড়িকাঠের ফোকর থেকে

বেরিয়ে সে কোন্ ভোরে।

কিঁচির মিঁচির বলে কি?

ইচ্ছে করে শিখে নি।

কেমন করে পারি!

ইংরিজি কি বাঙলা থেকেও

শক্ত আরো ভারি।

চড়ুই, চড়ুই চড়ুইটি

উঠোন খুঁটে যায়।

ভুলো-মেনির দেখা গেলে-ই

কোথায় উড়ে যায়।

কোথায় যে যায় জানি কি!

ইচ্ছে করে সঙ্গ নি।

কেমন করে যাই!

মা-র যে মানা, উঠোনখানার

বাইরে যেতে নাই।





চড়্‌ই, চড়্‌ই চড়্‌ইটি
 আমায় ঢেঁচেনে কই!
 দিনরাত্তির দুজনে তবু
 এক বাড়িতে-ই বই।
 বাসায় ঢুকে করে কী?
 ইচ্ছে করে দেখে নি।
 কেমন করে উঠি?
 বস্তু উঁচু, কাছেপিঠে
 নেই মই কি খুঁটি।



অনুশীলন

১.



এই পাখিটি লক্ষ্যে পাঁচটি বাক্য লেখো।



আমি বললুম, আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল। এবার কুমির? আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শূয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারি বিগ্গিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচ বেদেঁদে ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাঁধারি চাটছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঠার ঠাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেঁদে একবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ওই দানো গিরগিটির গলার পৌড়ের উপর পৌঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে। আমি বালুত হয়ে বললুম, তার পরে? আবদুল বললে, তার পরেকার খবর তাকিয়ে গেছে জলের তলার, তুলে আনতে দেরি হবে।

অনুশীলনী

১. গল্পটি পড়ে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

এ বাঘের ছাগলানা।

একদিন আবদুল মাফি —। হঠাৎ —। তীব্র —। নৌকা —।

আবদুল মাফি —। সাঁতরে —। কাছি ধরে —।

— দেহেতে লাফ — বাঘটি মাফি খেতে খেতে উঠে এলো —।

আবদুল বসিতে — লাগাল। ☒ বসত তার গলার — মাফিকে দিল।

এভাবে সে বাঘকে ধরে — বাজা।

২. আবদুল মাফি লাগতে কী কী মিনিস এনে দিত?

৩. আবদুল মাফির চেহারা কেমন ছিল?

৪. কাঁচ বেদেঁদে কুমিরের মুখ থেকে ছাগলছানা কীভাবে রক্ষা করেছিল দেখো।

৫. বদরনাচ তোমরা দেখেছ। একটি বাঘবনাচেও গল্প দেখো।

মৌখিক

শরীরের মালমশলা

সুকুমার রায়



এখানে একটা বাস আছে। বাসটা কাঠের তৈরি। শুষ, কাঠ? না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কী আছে? আর তার গায়ে চকচকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইট কাঠ লোহা চুন সুরকি বালি সিমেন্ট রং তেল, এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমূল্য জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার-দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ বসে আছে—বলতো কীসের তৈরি মানুষ? কীসের তৈরি, তার একটু নমনো শুনবে?

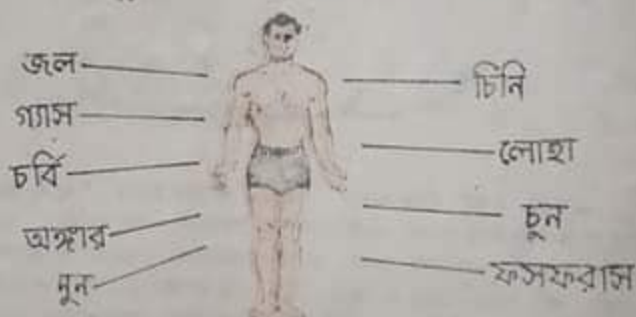
হু মশ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমুশ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড়ো বড়ো তিন-চার কলসি জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বার করতে চাও, তাহলে এত গ্যাস বেরোতে পারবে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু, একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে বার নাম আছে—বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ওই ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় মোটা গ্রিনেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তা ছাড়া খাতি মগের বা মূল-কল্যাণ এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেন্সিলের সীস তৈরি হতে পারে। যারা সের পাখুরে কলার মধ্যেও অতখানি অপব্যবহার

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার-করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টকটকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যায়াম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশানো ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা খাত্ত বার করে খাঁটি শুদ্ধ লোহা বানানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়—চুন আর ফসফরাস। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফসফরাস দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মশলা তৈরি হয়, আর ইন্দুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফসফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সেও ঐ ফসফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফসফরাস বার করা যায় তা খাওয়ালে মস্তত পাঁচশ মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।



অনুশীলনী

১. পক্ষী থেকে বিপরীত অর্থের শব্দগুলো বেছে নিয়ে গ্রিক ভাষায় দেখো :
(শক্ত, বেশি-মবল, নীচ, পেছনে, মজ, বিশেষ,)
সামনে—আগা—উর্ধ্ব—, মাথার—, কম—, মোটা—, চবল—।
২. মানুষের শরীরে কী কী পাওয়া যায় ?
৩. লোহা কম পড়লে শরীরের কী কী ক্ষতি হবে ?
৪. জোয়ার শরীরের নাক, জোখ, হাত, পা, কান, মূত্র, লাঠ-এর কী কী কাজ দেখো।

মৌখিক

১. কানের বাহ্য ঠোঁটের ভেতরে কী কী জিনিস পাশে ?
২. একটা বাড়ি ভেঙে-কবরে কী কী জিনিস পাশে ?



পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



পালকি চলে !
পালকি চলে !
গগনতলে
আগুন জ্বলে !
মৃত্যু গায়ে

আমূল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রোদ্রে সারা !
ময়রা মূর্খ
চক্ষু মূর্খ
পাটায় বসে
ঢুলছে কণ্ঠে !
দুখের চাঁছ
শুয়েছে মাছি—
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে ।

আসছে কারা
হনহানিয়ে ?
হাটের শেষে
রুদ্ধ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধরা হাটুরে !
কুপুপুলো
শুকছে ধুলো—
ধুকছে কেহ
ক্রান্ত মেহ ।

ঢুকছে পোত,
সোকানখরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে ।
পালকি চলে
পালকি চলে—
দুলকি চালে
নৃত্য-তালে ।
ছয় বেহারা—
জোয়ান, তারা—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগা বাড়িয়ে
নামল মাঠে
তামল ঝোটে !
তপ্ত তামা—
যার না থামা—
উঠছে আল
নামছে গাড়ায়—
পালকি সোলে
চেউয়ের নাড়ায় ।





জেউয়ের দোলে
অপা দোলে।
মোঠো জাহাজ
সামনে বাড়ে—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে।
তাকাই দূরে
শুনো ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে।
গোরুর বাথান
গোয়াল-খানা—
ওই গো! গায়ে
ওই সীমানা!

অনুশীলনী

১. নালকি-বাথকেরা যেতে যেতে কী কী দেখতে পেল?

মৌখিক

১. কবিতাটিতে কোন দ্রব্যের বর্ণনা আছে?

২. কীভাবে বোকা যায়?

অভিধান

অ

অক্ষয়—	দুর্ভাগ
অগ্রগতি—	উন্নতি
অগ্রসর—	আগরান, সামনে-যাওয়া
অনুভূত—	দুর্ঘটনা
অপার—	কয়লা
অপভ্রুত—	মজার, বিস্ময়কর
অনায়াসে—	সহজে
অনুসরণ—	পিছু খাওয়া, অনুগমন
অক্লান্ত—	কমসকম, কম করে
অপকল্প—	খুব সুন্দর, অপূর্ণ
অবলম্বন—	আগ্রহ
অব্যাহত—	সহজে, অনায়াসে
অবাক—	বিস্মিত
অত্যন্ত—	খুব বেশি
অশান্ত—	দুঃস্থ
অসতর্ক—	অসাবধান
অসহায়—	দুর্ভাগ
অসাড়—	অবশ
অস্থির—	চঞ্চল

আ

আকুল—	অস্থির, চঞ্চল
আদ—	সদমূল
আড়ালে—	পোপনে, আঁড়ে
আড়—	আড়ালে
আঁহকে—	ভয়ে চমকে
আদিম—	খুব পুরানো
আনুল—	খোলা, আলাকা
আমোদ—	আনন্দ, ফুটি, আহ্লাদ
আশ্বাজ—	অনুমান
আলে—	জমির বাঁধে
আলনা—	ঢিলা, খোলা, আলাদা
আশ্রয়—	আকাশ
আন্ত—	পোটা
আহবান—	ডাক, নিঃশব্দ

উ

উৎপাদন—	সৃষ্টি, তৈরি
উদয়গার—	খাওয়া, ভোজন
উদ্ভীড়—	খুশি, উত্তেজিত
উপাধি—	পদবী

এ

একত্রে—	অবাধা
এড়া—	খুব

ক

কঠিন—	শক্ত
কাকি-কাঠি—	ঘরের ছাদ-ঘরে রাখবার কাঠ
কড়—	কখনও
কতবা—	করার মতো কাজ, করণীয়
কর্ম—	কাজ
কলবর—	শরীর, দেহ
কলেইসুলেট—	বহুকলেট
কাছেপিটে—	কাছাকাছি
কালার—	মতাম, শেষ
কাতে—	কসল কাটবার ঝাঁপ
কুলে—	ভীর
কৌতূহল—	জানবার আগ্রহ
কমাগত—	অবিরাম
কোশ—	৮০০ হাত, দু' মাইলের কিছু বেশিপথ
কোজ—	শ্রান্ত
ক্রেসে—	ছোটো
ক্রেপে—	রেগে, চটে

খ

খাতি—	আপল, ভোজন-ছাড়া
খাবি খাওয়া—	খাসকলেটের জন্য মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া
খালি—	খুব বিপদে অসহায়ভাবে হাঁসফাঁস করা
খিচা—	কাঁকা, শুধু
খুশি—	হঠাৎ জোর টানা
	আনন্দিত, সম্পূর্ণ

গ

গগন	আকাশ
গজ	হাট, বড়ো মাঝার
গোবিন্দ	মৌচু আয়তায়, পড়ে
গুণা	একরকম গাছের ডাল রঙের রস
গিরিগিটি	টিকটিকি
গুণ	নৌকা টেনে নেবার দড়ি
গুহু	সংসারী লোক
গে	গিয়ে
গোয়ালখানা	পত্রের আখানা, পোশাক

ঘ

ঘরমঘর	সারামঘর, ঘরমুড়ে
ঘোড়াও	আটক

চ

চন্দ্রকান্ত	সুব ডাঙো
চবি	ঘেন, শরীরের তেলের মতো জিনিস
চাঁপড়ে	চুল, উত্তিরে
চাঁকড়	ঝড়ো এলা
চাপাটি	ঘাটে চাপড়ে তৈরি রুটি
চুকা	শুষ্ক
চির	সর্বদা
চেহারা	আকৃতি
চোখান	মুখের মধ্যে যে ঘাড়ের উপর দাঁত বসানো থাকে, হন

ছ

ছটা	কিরম, আশো
ছানা	বাঁধা, চটকে মাথা
ছঁচলো	সুব সরু

জ

জকো	একর
জবাব	প্রশ্নের উত্তর
জরুরি	সুব মনকারি
জরুরি	যে ছবি জলে ডিজিয়ে অন্য কাগজে ছাপ তোলা যায়
জিস	এক ডয়েমি, পৌ, রোম
জোয়ানো	জাতি
জাবাব	পেশা, চুতি

জোয়ান— সন্তানরাহ
জোরসে— সুন জোর
জোয়ানি— যা জোয়ানো যায়

ঝ

ঝাঁসর	ঝাঁসর তৈরি নাদাময়
ঝাড়	ঝোপ, একসরে অনেক
ঝাঁক	ভাল, দায়িত্ব

ট

টটিকা	ভাজা
টালি	তামার খালার

ঠ

ঠাসি	ঠেসে, ঠেলে ধরে
------	----------------

ড

ডর	ভয়
ডাঙা	ঘনী বা পুকুরের পাড়
ডানপিটে	সুব সাহসী, দুর্দান্ত
ডিতি	একরকম ছোটো নৌকা
ডুলি	দোলা
ডোকা	ছোটো সরু নৌকা, শালতি

ঢ

ঢানু	পড়ানো, নীচু
------	--------------

ত

তাড়া	খাওয়া
তুফান	মারুফ ঝড়
তুমুল	ভীষণ
তুমার	ওড়ো বরফ
তোড়	স্রোতের বেগ

দ

দগ্ধ	পল্লী
দমকা হাওয়া	যে হাওয়া হঠাৎ হঠাৎ জোরের আসে
দানো	দৈত্য, অসুর
দারিদ্র	অভাব
দারুণ	সুব
দুশ্চর	করেকটী, দু'চাকটী
দৌরাখা	দুরন্তপনা